IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিকে ধর্ম: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

SANTANU KUMAR HAIT

Ph.D. RESEARCH SCHOLAR, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

VIDYASAGAR UNIVERSITY

## Abstract

In Indian culture morality is inextricably related with dharma and take the form of dharmaniti. Dharma is that which upholds the man, the society and above all the universe. On the other hand, morality is not just a bundle of few rules or principles designed for living a life with material or sensual pleasure, rather a behavioural pattern or style for healthy, disciplined and righteous life mingled with a feeling of empathy and compassion. The prime aim of dharmaniti is to serve the most and absolute well-being of each and every member of this universe and any violation of this dharmaniti, provoked by evil inclinations, leads to unwanted harmful adverse effects. Basically, In Indian context dharma designated as right conduct, following which morality is fully revealed within a man.

In this article, I am trying to deal with certain aspects of the very concept of this dharma as it has been referred in Indian philosophical tradition.

Keywords – Dharma, morality, sadācāra, ṛta, peace, co-existence.

ভারতীয় দর্শনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে ধর্মনীতির ভাবনা। বস্তুতঃপক্ষে বৈদিক ঋষিগণ সামাজিক সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং কল্যাণমুখী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মূলক পবিত্র জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য ধর্মনীতির এক নিগড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন – বৈদিক সাহিত্যে এই ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ঋক্‌বেদে সংজ্ঞান সূত্রে সংহতি মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা জানানো হয়েছে- সকলে মিলিত ভাবে গমন করুক, মিলিত ভাবে স্তব উচ্চারন করে, মিলিতভাবে সকলের মন সমস্ত কিছুকে জানতে যেন সমর্থ হয় । দেবতারাও যেমন- একত্রে মিলিত ভাবে যজ্ঞের হবি-র ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই যেন সকলে সন্মীলিত ভাবে যাবতীয় সম্পদ ভোগ করে-

*"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।*

*দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।*

*সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।*

*সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হাবিষা জুহোমি।।*

*সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।*

*সমানসত্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।"*[১]

অতএব, স্পষ্টতই জীবনকে সদ্ উপায়ে পরিচালিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমার আলোচনা দার্শনিক তথা নৈতিক মননে সমৃদ্ধ এই 'ধর্ম'কে- কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হলেও- এর একটি মুখ্য অর্থ রয়েছে। প্রাচীন মতে 'ধর্ম' বলতে বোঝায় –" ধরণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ"[২]- অর্থাৎ যা সমাজ ও মানুষকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। 'ধর্ম' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করে বলা যায়- 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় যুক্ত করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে 'ধৃ' ধাতুটি ধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়, অতএব যা সমাজ তথা ব্যাপকভাবে এই চরাচর বিশ্ব-রূপ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম- "ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্টা"[৩]। অর্থাৎ এই ধর্মই সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছে অর্থাৎ- "সর্বস্য ধারকম্" [৪]। বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে – ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব তথা তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ধর্মাচরণ ও ধর্মপালন একান্ত অবশ্যকর্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে ধর্ম হল মানুষের জীবনচর্যার সাথে সম্পৃক্ত নৈতিক কর্তব্য। ভারতীয় প্রাচীন নৈতিক ভাবনাতেও সর্বদা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তুলনায় নৈতিক সদাচার বা সৎ কর্তব্য-কর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মহর্ষি মনু 'ধর্ম'-এর লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন-

*"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ*

*হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত"*[৫]

অর্থাৎ দ্বেষ, রাগ, বিবর্জিত, বিদ্বান, সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা যা অনুষ্ঠিত এবং হৃদয়ের দ্বারা অনুসঞ্জাত তাই ধর্ম, অতএব এই স্থলে উপরোউক্ত বিশেষণ যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা যে যে আচরণ পালিত হয় বা অনুষ্ঠিত হয়,তাকেই ধর্ম নামে অভিহিত করা যেতে পারে, আর বিপরীত পক্ষে অধর্ম বলতে বৈদিক অবিহিত পাপজনক কর্মসমুহকে বোঝায়। ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু বলেন--

*"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ*

*এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।।*[৬]

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি- এই চারটিকে ধর্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলা হয়ে থাকে – যা শাস্ত্র কর্তারা নির্দিষ্ট করেছেন। লক্ষনীয় বিষয় এই যে- বেদ স্মৃতি ও শিষ্টাচার ছাড়াও বিবেকের অনুমোদনকে এক্ষেত্রে ধর্মের লক্ষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্লোকে উক্ত 'আত্মতুষ্টি' শব্দটি অন্তর বা বিবেকের অনুমোদনকে বোঝায়।

ধর্মের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক উন্নতি সাধন, যা সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও সামগ্রিক কল্যানের ভিত্তিস্বরূপ। এবং এই ধর্মনীতি যদি লঙিঘত হয় তাহলে অকল্যাণ এবং শাস্তি নিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে মনু বলেন- মানুষের যাবতীয় কর্মই কাম দ্বারা পরিচালিত এবং তা কখনোই প্রশংসনীয় নয় কারণ কাম হল তমোগুণ প্রকাশক, তাই কামকে নিয়ন্ত্রন পূর্বক মানুষ যাতে সম্যকভাবে ক্রিয়া করতে পারে- তার জন্যই ধর্মের উৎপত্তি। যে সমাজ যত বেশি ধর্মের প্রতি অনুগত, সেই সমাজ তত বেশি সমন্বিত তথা সুরক্ষিত। অপরপক্ষে

যে সমাজ ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, সেই সমাজে তত বেশি ক্ষতি সাধিত হয় এবং তা অবিন্যস্তরূপ ধারণ করে।

*"ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত*

*তস্মাদ্ ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽধীত্"*[৭]

অতএব যা কিছু জগতের কল্যাণ ও অহিংসার উদ্বোধক এবং নৈতিক প্রগতির সহায়ক, তাই ধর্ম। এই সদাচার- ধর্মের মধ্যে দিয়েই মানুষের অভ্যন্তরে নীতি বোধ জাগ্রত হয় এবং সে কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতেও যে ধর্মাচার গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, তার সবগুলি নৈতিক আচরণ বিধি বা কার্যকলাপ। প্রসঙ্গটি মহর্ষি মনু কে অনুসরণ করে সামান্য বিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্মের বিভাগ প্রসঙ্গের মনু বলেন –

*"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ*

*ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধ্যে দর্শকং ধর্মলক্ষনম্□□"* [৮]

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অজ্ঞেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ- এই দশটি প্রকার হলো ধর্মের লক্ষণ, এবং যে ব্যক্তি এই গুণগুলি অর্জন বা আয়ত্ব করেছেন তিনিই যথার্থ ধার্মিক।

ধৃতি হল ধারণ বা ধৈর্য বা সন্তোষ অর্থাৎ নিজের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে অবিচল এবং স্থির থাকাই হল ধৃতি, যা প্রতিটি ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নতির অন্যতম প্রারম্ভিক স্তম্ভ। বস্তুতঃপক্ষে আত্মবিশ্বাসী মানুষের পক্ষেই যাবতীয় প্রতিকুল, প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সদর্থকতার প্রসার ঘটানো সম্ভব।

'ক্ষমার' অর্থ অপরাধ মার্জনা – যার মধ্যে দুভাবে সদর্থক ভাবনা ক্রিয়াশীল, প্রথমত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনে বহু ক্ষেত্রেই সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা করে- ফলে তার চরিত্রের সংশোধন হয়, এবং দ্বিতীয়টি হল মার্জনাকারী ব্যক্তিটিও এক সুদীর্ঘ মানসিক উত্তেজনা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং আত্মপ্রশান্তি অনুভব করে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় ধর্মনীতিতে সর্বদাই পরিস্থিতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবশ্যিকতা স্বীকৃত হয়েছে- অনমনীয় ভাবে নৈতিক বিধি পালনের সে বিপক্ষে, অতএব পরিস্থিতি সাপেক্ষে ক্ষমা যেমন প্রয়োজন তেমনই সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে শাস্তির প্রয়োজন-ও অবশ্য স্বীকার্য- নতুবা অধর্মের কৃষ্ণরূপে চরাচর আছন্ন হয়ে পড়বে।

দম বলতে সহনশীলতা কে বোঝায়। মানুষ সামাজিক জীব এবং সে সর্বদাই এক সুস্থিত, সংহত সমাজ ব্যবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতে চায়। সমাজে এই স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সহনশীলতা এক অতি আবশ্যক শর্ত। বস্তুতঃপক্ষে আধুনিক বা বর্তমান যুগের জাতি-অসহিষ্ণুতা, ধর্ম-অসহিষ্ণুতা, দেশগত-অসহিষ্ণুতা পৃথিবীকে যে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে দিচ্ছে তার একমাত্র পরিণাম ধ্বংস। অতএব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

অস্তেয় হল অন্যের দ্রব্য (সেটি প্রাণ যুক্ত হোক বা অপ্রাণ) অপহরণ না করা অথবা অন্যের দ্রব্যের প্রতি কোন রকম আসক্তি না থাকা। আরও বক্তব্য এই যে এক্ষেত্রে শুধু শরীর দ্বারা অগ্রহণ নয়, মানসিক অগ্রহণ কেও বোঝানো হয়েছে।

শৌচ হল একটি নৈতিক কর্ম। শৌচ হল শরীর ও মনের শুদ্ধতা, যা দুই প্রকার- বাহ্য ও আন্তর। পবিত্র সলিলে প্রত্যহ স্নান করা, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা, সাত্ত্বিক আহার করা হল বাহ্য শৌচ, অন্যদিকে মনকে সমস্ত রকম কুচিন্তা থেকে সরিয়ে রাখা এবং দয়া, মায়া প্রভৃতির অনুশীলন আভ্যন্তরীণ শৌচ। মানসিক শৌচ পালনের ফলে চিত্ত প্রশুদ্ধ হয়, যার ফলে অন্তরে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় এবং মনের একাগ্রতা বাড়ে।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হল বাসনার মূল স্বরূপ যাবতীয় ভোগ্য বিষয় থেকে প্রত্যাহার পূর্বক ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখা বা যাবতীয় ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা।

ধী ধর্ম পালনের নিমিত্ত আবশ্যক বা প্রয়োজনীয় একটি নিয়ম, যার অর্থ বুদ্ধিমত্তা বা বিচার শক্তি। এই বিচার শক্তি তথা বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনের সাথে শাস্ত্রতত্ত্ব মূলক জ্ঞান অর্জন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ।

বিদ্যা বলতে বোঝায় জগত বা জাগতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্যমূলক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হওয়া।

সত্য হল ধর্মের সবচেয়ে উচ্চতম স্তর। জগতের সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে এই সত্য। সত্য পুরুষার্থ সমুহের ভিত্তিস্বরূপ এবং সুখ ও আনন্দের মূল উৎস। সত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় বিশ্বের নৈতিক শক্তি বা ঋত। ঋত যেরকম অপরিণামী, সত্যও তাই। সত্য প্রসঙ্গে মনু বলেছেন-

*সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্*

*প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।*[৯]

অর্থাৎ অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয়, তা বলা উচিত। অতএব অপ্রিয় সত্য যেমন বলা উচিত নয় তেমনি প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়- এটাই হল সনাতন ধর্ম। মহাভারতেও যে চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে সত্য ধর্মকে পাথরে খোদাই বিধি রূপে অবশ্য পালনীয় বলা হয় নি, বরং সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে তাকে লঙঘন করা যে অপরাধ নয়, তা বিচার সহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তপোবনে কৌশিক নামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি সত্যকথনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই বিষয়ে তাঁর প্রচুর খ্যাতিও ছিল। একদিন তিনি তাঁর কুটিরে বসেছিলেন, সেই সময় দস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিছু নিরীহ লোক ওই তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে পড়তেই দস্যুরা তপোবনে এসে উপস্থিত হয় এবং নিরীহ লোকেদের খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, কিন্তু তারা ওই লোকেদের না পাওয়ায় ঋষি কৌশিককেই ব্রাহ্মণকেই জিজ্ঞাসা করল- "মহাশয় কিছু লোক এখানে এসেছিল তাঁরা সব কোথায় গেল? আপনি সত্যবাদী মানুষ এই ব্যাপারে আপনার জানা থাকলে আমাদের সত্য বলুন যে, তাঁরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে"। কৌশিক নিজ সত্যের অহংকারে দস্যুদের সত্য জানিয়ে বললেন যে তাঁরা ওই বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। দস্যুরা তখন তাদের সবাইকে বের করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই অমঙ্গলজনক সত্যকথনের জন্য কৌশিকের নরক প্রাপ্তি ঘটে।[১০]

অক্রোধ প্রসঙ্গে বলা যায়, বস্তুতঃপক্ষে দুঃখ অতিক্রম করে আনন্দ পাওয়ার জন্য ক্রোধকে সর্বোতভাবে বর্জন করা উচিত, কারণ ক্রোধবশত বহু সময় ব্যক্তি এমন কিছু হঠকারী আচরণ করে, পরবর্তী সময়ে যে প্রসঙ্গে অনুতপ্ত হলেও তার করনীয় কিছু থাকে না।

ভারতীয় শাস্ত্রে বা দর্শনে 'ধর্ম' শব্দটি যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরাতাত্ত্বিক অর্থ এবং নৈতিক অর্থ। পরাতাত্ত্বিক অর্থে ধর্ম হল অলঙঘনীয় বা বিশ্বনীতি যা 'ঋত' নামে অভিহিত হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে ঋত-ই হল ধর্ম। এই বিশ্বজগতকে এক অমোঘ শৃঙ্খলায় যা আবদ্ধ করে সেই নীতিটিই 'ঋত'। অর্থাৎ এই ঋত- এর মাধ্যমেই বিশ্বের বিবিধ শক্তি সমূহ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয় এবং এক সু-সংহত জগতের প্রকাশ ঘটে। এই ঋত অনুসারে সূর্য, চন্দ্র – প্রভৃতি আপন আপন কক্ষে আবর্তিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, নিয়মিত দিন-রাত্রির আবর্তন হয় প্রভৃতি—এমনকি দেবতাগণও এই ঋতকে লঙঘন করতে পারেন না। দ্বিতীয় কল্পে, 'ধর্ম' শব্দটির নৈতিক তাৎপর্য এই যে- ধর্ম হল সেই নৈতিক বিধি যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করে, যার মাধ্যমে মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সে সামাজিক কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত করে[১১]। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, 'ধর্ম'-এর যে পরাতাত্ত্বিক ধারণা তা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি, বস্তুত 'ধর্ম' শব্দটির মধ্যে কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। কিন্তু ধর্ম শব্দটি নৈতিক ধারণা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে 'ধর্ম' বলতে মানুষের কর্তব্যকে বোঝানো হয়, যা শুধুমাত্র নৈতিক নয়, তার একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট বা পটভূমিও রয়েছে।

বৈদিক মতানুসারে ধর্ম বলতে আত্মত্যাগকে বোঝানো হয়েছে- এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ঋক্ বেদের পুরুষসূক্তে, যেখানে বলা হয়েছে, জগত সৃষ্টির পূর্বে শুধুমাত্র স্রষ্টারই অস্তিত্ব ছিল তিনি ব্যতিত অন্য কিছুই ছিল না, স্রষ্টার ইচ্ছা হল যে তিনি বহু হবেন, তখন তিনি সৃষ্টির কথা ভাবলেন এবং ওই সৃষ্টি যজ্ঞে স্বয়ং নিজেকে আহুতি প্রদান করলেন। এই আত্মত্যাগ আদিমতম ধর্ম বা প্রকৃষ্টতম ধর্মরূপে অভিহিত হয়ে থাকে-

*"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।*

*তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ"*[১২]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ধর্ম মঙ্গলস্বরূপ– *সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্দ্ধর্ম্মং বদতীতি, ধর্ম্মং বা বদন্ত সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।।* [১৩] অর্থাৎ যা ধর্ম তাই সত্য। এই কারণেই সত্যবাদীকে লোককে বলা হয় সে সত্য কথনের মাধ্যমে ধর্ম পালন করছে; আবার ধর্মবাদী লোককে বলা হয় তিনি ধর্ম বলছেন অর্থাৎ তিনি সত্য বলছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এই ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি সুন্দর উপাখ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয় যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যজাতি-ই ছিল। ব্রাহ্মণ্যজাতি একাকী সমস্ত কর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ না হয়ে প্রথমে উত্তম জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতিকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাঁর দ্বারাও সমস্ত কর্ম সম্পাদনে সক্ষম না হওয়ায়, তিনি ক্রমপর্যায়ে বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সৃষ্টি করলেন। এই ভাবে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেও, তাদের দ্বারাও যাবতীয় কার্য সম্পন্ন না হওয়ায় তিনি 'ধর্ম' নামে একটি অতিশয় শ্রেয়স্কর বস্তু সৃষ্টি করলেন।

*"তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদযশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ব্রহ্ম"* [১৪]

বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্রে ধর্মের লক্ষনে বলেছেন-

*"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"* [১৫]

অর্থাৎ এখানে 'অভ্যুদয়' শব্দের অর্থ স্বর্গ এবং নিঃশ্রেয়স হল মোক্ষ বা মুক্তি, অতএব যার মাধ্যমে স্বর্গ-এর সিদ্ধি হয় এবং যা থেকে মুক্তি বা মোক্ষ হয় তাই ধর্ম। যার অনুষ্ঠানে ব্যক্তিমানুষের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং পরমকল্যাণ সাধিত হয় তাই ধর্ম। আবার অন্য এক অর্থে অভ্যুদয় শব্দের দ্বারা অর্থ ও কাম বিষয়ক প্রবৃত্তি, যা সাময়িক সুখ প্রদান করে তাকে এবং নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা মোক্ষ বা দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থায়ী সুখ লাভ সম্ভব।

বৈশেষিক সুত্রের অন্যতম ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য 'ধর্ম'কে পুরুষের গুণ রূপে অভিহিত করেছেন, যা আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ এবং বিশুদ্ধ অভিসন্ধি- "ধর্মঃ পুরুষগুণঃ" [১৬] অর্থাৎ ধর্ম হল পুরুষের গুণ। এখন প্রশ্ন হল, এই অতিন্দ্রিয় ধর্ম কি কি কারণ থেকে উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশস্তপাদাচার্য বলেন যে, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ এবং পবিত্র অভিপ্রায় বা অহংকারশূন্য বিশেষ সংকল্প থেকে এই ধর্মের উৎপত্তি হয়। সহজ কথায় ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যে তিনটি কারণ বর্তমান- সমবায়ি, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ, সেগুলি হল যথাক্রমে আত্মা, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ এবং প্রত্যেক বর্ণ ও প্রত্যেক আশ্রমের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-সম্মত সাধন সমূহ। এই ধর্ম তখনই বিনষ্ট হয় যখন অন্তিম বিশেষ সুখের সম্যক জ্ঞান আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।

প্রশস্তপাদাচার্য ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ব্যখ্যার পর সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম-এর ক্ষেত্রে সামান্যভাবে এবং বিশেষভাবে ধর্মের যে সাধনগুলি রয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ ধর্ম হল সামান্যধর্মের সাধন এবং বিশেষ ধর্ম হল বিশেষধর্মের সাধন। সাধারণ ধর্ম- বর্ণ ও আশ্রম নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় অর্থাৎ এর লক্ষ্য হল সকলের কল্যাণসাধন এবং বিশেষ ধর্ম- বর্ণ ও আশ্রম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ সেটির লক্ষ্য হল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন। বস্তুতঃপক্ষে আচার্য প্রশস্তপাদ-এর মতে জাতি-বর্ণ-আশ্রম নির্বিশেষে সাধারণ ধর্মগুলো মানুষ হিসেবে পরিচিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে সাধারণ ধর্মগুলির সংখ্যা ত্রয়োদশ, যথা – ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্বম্, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অনুপধা, ক্রোধবর্জন, অভিসেচন, শুচিতা,

বিশিষ্ট দেবতার প্রতি ভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ।[১৭] বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলা যায়- 'শ্রদ্ধা'র অর্থ হল প্রসন্নতা, ধর্ম উৎপন্ন হয় মনের শ্রদ্ধা থেকেই। কোন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সেখান থেকে ইষ্ট বা জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে –"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্"[১৮]। 'অহিংসা' শব্দটির অর্থ কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা আচরণ না করা বা তাকে কোন প্রকার আঘাত না করা। অহিংসার অর্থ কেবল যদি- আঘাত না করা, হিংসা না করা এরূপ করা হয়, তাহলে সেখান থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় না। তাই যাবতীয় নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে সদর্থক মনোভাব নিয়ে কোন প্রাণীকে আঘাত না করার যে দৃঢ় ইচ্ছা, তাই হলো ধর্ম। ভূতহিতত্বম্- এর অর্থ হল- সকল প্রাণীর কল্যান বা মঙ্গল সাধন। আমাদের উচিত সকল প্রাণীদের প্রতি উপকারের মনোভাব পোষন করা। এখানে ব্যাসদেবের একটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে- "পরোপকারো ধর্মঃ, অধর্ম পরপীড়নম্"[১৯] অর্থাৎ পরের উপকার-ই ধর্ম এবং অপরের অপকার-ই হল অধর্ম। সত্য হল সত্য কথা বলা, সত্য মননে সমৃদ্ধ হওয়া- মনের ও মুখের অভিন্নতাই হল সত্যধর্ম। আচার্য -উপদেশে বলা হয়েছে সত্য কথা অপ্রিয় হলেও বলা অবশ্য কর্তব্য। আক্ষরিক অর্থে অস্তেয় হল- চুরি না করা। অশাস্ত্রীয়ভাবে অপরের দ্রব্য গ্রহণ না করাই হল অস্তেয়। প্রশস্তপাদাচার্য বলেন- শুধুমাত্র চুরি করা থেকে বিরত থাকার বাহ্যিক আচরণ অস্তেয় নয়, এমনকি মানসিক ভাবেও পরের দ্রব্য হস্তগত করবার যে অনৈতিক চিন্তা সেখান থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্পই হল অস্তেয়। ব্রহ্মচর্য হলো ব্রহ্মচারীর আচরণ বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে প্রযত্নবান ব্যক্তির আচরণ। বাহ্যিক সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা থেকে বিরত হয়ে, শারীরিক ও মানসিক যে কোন ভাবেই স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করার যে দৃঢ় সংকল্প তাই হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের পরের সাধন হল অনুপধা। উপধা শব্দটির অর্থ হল- প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করার ইচ্ছা। অতএব অনুপধা কথাটির হল প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করার ইচ্ছা না থাকা বা অনিচ্ছা। অর্থাৎ যে কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকাই হল অনুপধা। ক্রোধবর্জন বলতে বোঝায় আন্তরিকভাবে যাবতীয় প্রকার প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করে ক্রোধ বর্জন করা। প্রত্যহ স্নানের দ্বারা দেহের শুদ্ধি হল অভিসেচন। শুচিদ্রব্যসেবনম্ হল নির্দিষ্ট তিথি উপলক্ষ্যে নিয়মিত শুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ তিল প্রভৃতি দ্রব্যের সেবনের মাধ্যমে দেহ ও মনকে পবিত্র রাখা। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রে যে দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট দেবতাকে ইষ্টজ্ঞানে ভক্তি করাও ধর্ম নামে অভিহিত হয়ে থাকে। একাদশী বা কোন এক বিশেষ তিথি উপলক্ষ্যে সমগ্র দিবস ব্যাপী কোন প্রকার ভোজন না করাই হলো উপবাস। এবং সব শেষে অপ্রমাদ হল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের আবশ্যিক অনুষ্ঠান। উপরে উল্লিখিত ধর্মগুলি সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমীর অবশ্য পালনীয় ধর্মরূপে বিহিত হয়।

প্রশস্তপাদচার্যের মত অনুসারে বিশেষধর্ম গুলি আলোচনা করা যেতে পারে। এই বিশেষধর্ম গুলি আশ্রম ও বর্ণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শাস্ত্রে চতুবর্ণের ও চতুরাশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের যে নির্দিষ্ট ধর্ম, তা তার স্বধর্ম এবং অন্য বর্ণ ও অন্য আশ্রমের ধর্ম তার কাছে পরধর্ম। এই চর্তুবর্ণ– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল- প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা, যাজন ও স্ববর্ণবিহিত সংস্কার। জীবিকা নির্বাহের জন্য সদ্ ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন রকম দ্রব্যাদি গ্রহণ করা হল প্রতিগ্রহ। অধ্যাপনা হল শূদ্রব্যতীত অন্য তিনটি বর্ণকে বেদ সম্বদ্ধে পাঠদান। যজ্ঞ করা ও পূজার্চনা করাকে যাজন বলে। স্মৃতিশাস্ত্রে আটচল্লিশ প্রকার যে সংস্কার বৈদিক কর্মের কার্যকারিতা উৎপাদনে সহায়ক, তাকে স্ববর্ণবিহিত সংস্কার বলে। ক্ষত্রিয়দের ধর্মের সাধন গুলি হল- প্রজাপালন, অসাধুনিগ্রহ, যুদ্ধ অনাবর্তন এবং স্ববর্ণবিহিত সংস্কার। যে সকল প্রজা শাস্ত্রকে অনুসরণ করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, তাদের কে বহিঃশত্রু এবং আভ্যন্তরীন গোলমালের প্রভাব থেকে রক্ষা করাই হল প্রজাপালন। দুষ্টের দমন হল অসাধুনিগ্রহ। যুদ্ধে জয়লাভ বা পরাজিত হয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না আসাই হল অনাবর্তন এবং শাস্ত্রবিহিত সংস্কারের বিধান-ই হল ক্ষত্রিয়দের স্ববর্ণবিহিত সংস্কার। বৈশ্যদের স্বধর্ম হল ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি, পশুপালন, শাস্ত্রবিহিত সংস্কার। ক্রয় ও বিক্রয় বলতে যথার্থ মূল্যে ক্রয় এবং যথার্থ মূল্যে বিক্রয়কে

বোঝানো হয়েছে। কৃষিকর্ম ও পশুপালন করা এবং শাস্ত্রবিহিত যে সমস্ত সংস্কার রয়েছে, তার অনুষ্ঠান করাই বৈশ্যদের বিশিষ্ট ধর্ম সাধন। উপরিউক্ত তিন বর্ণের সেবা করা এবং মন্ত্র উচ্চারণ না করে শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করাই হল শূদ্রদের বিশেষভাবে ধর্ম সাধন।[২০]

বর্ণধর্ম আলোচনার পর এখন আশ্রমভেদে বিশেষধর্ম পালনের প্রসঙ্গে আসা যাক। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। গুরুগৃহে বসবাস করার সময় একজন ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরু সেবা, অগ্নিতে হোম করা, হোমের জন্য কাঠ সংগ্রহ করা, ভিক্ষাচরণ করা – একজন ব্রহ্মচারীর বিশিষ্ট ধর্ম। গৃহস্থের বিশেষধর্ম হল, বিবাহের মাধ্যমে সংসার জীবন অতিবাহিত করা। এছাড়াও বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে ঋষি ঋণ শোধ করা , গার্হস্থ আশ্রমে মানুষকে নানাবিধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে যেমন- ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ সমস্ত প্রকার ঋণ শোধ করে। এই ঋণগুলি হল- দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, নৃঋণ এবং ভূতঋণ। গার্হস্থ জীবন সার্থকভাবে সমাপ্ত হবার পর ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে, যেখানে সে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বসবাস করে বিষয় সুখ থেকে ইন্দ্রিয়কে সর্বোতভাবে প্রত্যাহার করে সংযমপূর্বক ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকেন এবং বাণপ্রস্থ পর্যায় থেকে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রমের দিকে গমন করে। সন্নাসী কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে অবস্থান করেন না। সন্নাসী মনে এবং প্রাণে যম ও নিয়মে ব্রতী হবেন। তিনি জাগতিক নাম ও যশের সমস্ত রকম আশা পরিত্যাগ করে সমাধিলাভে সচেষ্ট হবেন। বিশুদ্ধ এবং একাগ্র মনের দ্বারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লাভ করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম সাধনার অঙ্গ। [২১]

মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সুত্রে ধর্মের লক্ষন প্রদান করে বলেছেন-

*চোদনালক্ষনোহর্থো ধর্মঃ* [২২]

এখানে 'চোদনা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রেরণা বা নির্দেশ, তবে এই স্থলে বিশেষ অর্থ অনুসারে ওই শব্দের দ্বারা বোঝানো হয় বেদের নির্দেশ, 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ হল 'যার দ্বারা জানা যায় বা জ্ঞাপিত হয়' এবং ''অর্থ' শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে অভিষ্ট বিষয়কে বোঝালেও উক্তস্থলে 'অভিষ্ট' লাভের উপায়-কে বুঝতে হবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে মহর্ষি জৈমিনি প্রদত্ত সুত্রটির অর্থ হবে, অভিষ্ট লাভের যে যজ্ঞাদি আচরণ প্রভৃতি বেদের নির্দেশাত্মক বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় তাই ধর্ম। অর্থাৎ ধর্ম বলতে অভিষ্টলাভের বেদনির্দিষ্ট উপায়-কে বোঝানো হয়েছে, দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায়- বেদে উক্ত হয়েছে *"দশপূর্নমাসাভ্যাং স্বর্গকাম যজেত"* [২৩] অর্থাৎ স্বর্গপ্রার্থী ব্যক্তি দর্শ বা আমবস্যা এবং পুর্নমাস বা পূর্নিমাযাগ করবেন- এই স্থলে ব্যক্তির অভিষ্ট হল স্বর্গ প্রাপ্তি এবং তাঁর উপায়রূপে দর্শপূর্ণমাস যাগ বিহিত হওয়ায় ওইগুলি ধর্মরূপে অভিহিত। প্রাচীন মীমাংসক পুরুষার্থ বলতে স্বর্গ সুখভোগকেই মনে করেন এবং এই স্বর্গ সুখভোগ একমাত্র বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পালনের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এখন কোন্ কর্মটি ধর্ম মূলক ও কোন্ কর্মটি অধর্ম মূলক, তা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোন্ কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ লাভ হয় কিংবা পূণ্যলাভ সম্ভব অথবা চিত্তশুদ্ধি রূপে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা প্রাপ্তি হয় এবং কোন্ কর্মের ফলে নরক বা পাপমূলক আধ্যাত্মিক অপকর্ষ হয় তার জ্ঞান এই শাস্ত্র ভিন্ন লাভ অসম্ভব, কারণ তা প্রমেয় বা প্রমাণান্তরের বিষয় নয়। এখানে শাস্ত্র বর্জিত মানুষের কল্পনার কোন স্থান নেই এবং সেই রকম যুক্তির সাহায্যে যা উপস্থিত হয় তা ধর্ম না হয়ে অধর্ম হয়ে পড়ে। এই কারণেই মহর্ষি জৈমিনি বলেন –

*"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষ্যং স্যাৎ"* [২৪]

অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম তত্ত্ব শুধুমাত্র বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র থেকেই জ্ঞেয় বলে, যা অশাব্দ বা যা শাস্ত্র নির্দিষ্ট নয় তা বর্জিতমাত্র। ধর্ম- অধর্ম অলৌকিক কেননা এই সকল ক্রিয়ার সঙ্গে পাপ-পূণ্য ফলের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তা প্রত্যক্ষ অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং একমাত্র ধর্ম-ই যদি যথার্থ কামনার বিষয় হয় তবে তা লাভ করার নিমিত্ত প্রয়োজন শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, পরম্পরাগত

আচরণের নিষ্ঠা, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে স্ব-স্ব অধিকার রূপ কর্মের অনুষ্ঠান এবং যাবতীয় শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মের পরিহার।[২৫]

বিশ্বগত ভাবে আধুনিক সমাজে এমন একটি দুর্নিতিগ্রস্ত পরিবেশ উদ্ভব হয়েছে, যেখানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, এমনকি আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্মুখিন হয়েছে চরম সংকটের এবং এই অসুরক্ষিত অনিশ্চিত অবস্থার জন্য দায়ী আমরাই। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে সীমাহীন অ-সংযমী চাহিদা, চুড়ান্ত বৈষয়িক ভোগ-লালসা, ষড়রিপু জনিত লজ্জাজনক উন্মাদনা, যার পরিণাম পৃথিবী জুড়ে ঘটে চলা হিংসাত্মক বা সন্ত্রাস মূলক কার্যকলাপ। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য্য যে মানুষ আধুনিকতার উগ্রতায় ভেসে গেলেও সে শুধুমাত্র সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি চায় না- নৈতিক উৎকর্ষতাও তার কাম্য কারণ বিবেকবর্জিত শরীর সর্বস্ব অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা মনুষ্যত্বেরই অপমান। তাই মানুষ সমাজ ও জীবনচর্য্যার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ধর্মকে অস্বীকার না করে অগ্রাধিকার দিয়েছে – এই ধর্মীয় বোধের প্রতি শ্রদ্ধা তার ভেতর এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, এতো স্বতঃস্ফূর্ত্ততার সাথে তার প্রকাশ ঘটে যে আজকের দিনেও বেপরোয়া, বিপদজনক হুমকি-সংস্কৃতির ভয়ঙ্কর পরিণামকে পরোয়া না করে অন্যায়ের বিরূদ্ধে মানুষের প্রতিবাদী গলা শোনা যায় শুধু নয়, সে প্রয়োজনে তার জীবনেরও বলি দেয়।

এই ধর্ম আচরণের গভীরতাপূর্ণ তাৎপর্য্যের প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ন কুন্তী সংবাদ' কবিতায় অঙ্কিত মহাভারতে দুই চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথোপকথনের মাধ্যমে। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র যখন প্রশ্ন করেছিলেন, 'কি দিবে তোমার ধর্ম?' ধ্বনিত হলো গান্ধারীর আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ সেই কন্ঠস্বর- " দুঃখ নব নব"। এবং তারপরই গান্ধারী ব্যক্ত করলেন সেই অমোঘ সত্যকে-

"ধর্ম নহে সম্পদের হেতু

মহারাজ নহে সে সুখের ক্ষুদ্রসেতু

ধর্মেই ধর্মের শেষ"

অর্থাৎ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিরপেক্ষ ভাবে ধর্মপালনই ধর্মের প্রথম ও শেষ কথা।

## তথ্যসূত্র


১. ঋক্‌বেদ ১০\১৯১\২-৪

২. নীতিশাস্ত্র, গুপ্ত দীক্ষিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-৭০০০৫৬,পৃষ্টা-২১

৩. ভারতীয় দর্শন ও তার প্রয়োগ বিশিষ্ট পটভূমিকা, গোপিনাথ ভট্টাচার্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৪

৪. নীতিশাস্ত্র, গুপ্ত দীক্ষিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-৭০০০৫৬,পৃষ্টা-২২

৫. মনুসংহিতা ২/১

৬. মনুসংহিতা ২/১২

৭. মনুসংহিতা ৮/১৫

৮. মনুসংহিতা ৯২/৬

৯. মনুসংহিতা ৪/১৩৮

১০. মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি,ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, পত্রলেখা, কল্কাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১৪৪

১১. নীতিশাস্ত্র, গুপ্ত দীক্ষিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-৭০০০৫৬,পৃষ্ঠা-২৩

১২. ঋকবেদ- ১০\৯০\১৬- ১\১৬৪\৫০

১৩. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১/৪/১৪

১৪. বৃহদারণ্যক উপনিষদ- ১/৪/১১

১৫. বৈশেষিক সূত্র - ১/১/২

১৬. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২১১

১৭. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২১৫

১৮. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২১৫

১৯. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২১৬

২০. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২১৯

২১. দর্শন-সমীক্ষা, চক্রর্বতী, তপন কুমার, সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৪ পৃষ্ঠা- ২২০

২২. মীমাংসা সুত্র ১/১/২

২৩. বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, গঙ্গোপাধায় শ্রীঅশোককুমার, শ্রীমতী সুপ্রিয়া গঙ্গোপাধায়, ৩\১ নীলমণি সরকার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬, পৃষ্ঠা-১৪

২৪. মীমাংসা সুত্র ১/৩/১

২৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা- শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা সহিত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কত্র্তৃক উনূদিত ও ব্যাখ্যাত। পৃষ্ঠা-৯০দ্রষ্টব্য